আপন কেউ

রমেন্দ্র নারায়ণ দে

ফোনটা তুলে ওপাশের গলা শুনে স্তব্ধ হয়ে গেল শুভদীপ। দীর্ঘদিন পর শোনা গেল এই গলাটা। গত পনেরো বছর ধরে বসে আছে শুভদীপ এই গলাটা শোনার জন্য, কিন্তু ডাক আসেনি। আজ যদিবা ডাকটা এল, এমন সময়ে এমন পরিস্থিতিতে এল, যে শুভদীপ এখন এ ডাকে সারা দিতে পারবে না।

অবশ্য এটাও ঠিক যে আজকের বিশেষ পরিস্থিতির জন্যই এখন ডাকটা এসেছে। মা মারা যাবার মত বিশেষ ঘটনা ঘটেছে বলেই উনি ফোন করে শুভদীপকে সান্ত্বনা দিতে বা তেমন কিছু বলতে চাইছেন। হয়ত ওর কাছে আসতে চাইছেন এই দুঃখের সময়ে। তবুও আজ তো শুভদীপ ওঁর সঙ্গে কথা বলতে পারবে না।

শুভদীপের ভাবনার কথা তো ফোনের ওপাশে পৌঁছায় না। কোন উত্তর না পেয়ে ওপাশে প্রদীপ অস্থির, তবে সেটা সে প্রকাশ করতে চায় না। প্রদীপের গলা শান্ত হলেও এদিকে শুভদীপ বুঝতে পারে সে স্বরের ভিতরে লুকিয়ে আছে উদ্বেগ। প্রদীপ আবার বলল, হ্যালো, শুভ, কথা বলছিস না কেন? আমি....

আমি এখন তোমার সঙ্গে কথা বলতে পারবো না বাবা, প্রদীপের কথার মধ্যে শুভদীপ বলল।

না না, তোকে কথা বলতে হবে না, প্রদীপ তাড়াতাড়ি বলল, আমি এখনই আসছি তোর কাছে।

না, তোমাকে আসতে হবে না, শুভদীপের গলা শান্ত কিন্তু পাথরের মত শীতল।

শোন শুভ, প্রদীপ আবার ছেলেকে বোঝাতে চেষ্টা করল, এটা রাগ করে থাকার সময় না। আমি আসছি।

না, তুমি এখানে আসবে না।

ফোনটা রেখে দিল শুভদীপ। ওপাশে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল প্রদীপ, কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

◈◈◈◈◈

সেদিনও এমনি স্তব্ধ হয়ে বসেছিল প্রদীপ। শুভদীপের ফোনটা কেটে দিয়ে নিজের মনে দগ্ধ হতে হতে বসেছিল নিঃশ্চুপ।

বাড়ি ভর্তি লোকজন। খাটে শোয়ানো বাবার মৃতদেহে চন্দন পরিয়ে, ধুপধুনো দিয়ে, ফুলের মালা পরিয়ে সাজানো হচ্ছে। একটু পরেই শ্মশান যাত্রা করতে হবে। সেদিকে তাকিয়ে থেকে প্রদীপ মনে মনে বলেছিল, আজ তুমি যখন চলে গেছো তখন ফোন করছে। বেঁচে থাকতে কত হেনস্থা তোমাকে করেছে সে তো আমি কোনদিন ভুলতে পারবো না। না বাবা, আজ তোমার অন্তিম সময়ে ওদের কাউকে তোমার কাছে আসতে দিতে আমি পারবো না। সেটা তোমাকে অপমান করা হবে।

সময় চলে যায় আপন গতিতে। তাই তো কখন কখন পনেরো বছর চলে গেছে সেদিনের সেই ঘটনার পর। আজ শুভদীপের কাছ থেকে শুভ্রার শ্মশান কাজে না যাবার নির্দেশ পেয়ে প্রদীপের সব মনে পড়ে গেল স্পষ্ট। সেদিন শুভদীপ আবার ফোন করেছিল, তখন ওরা শ্মশান থেকে ফিরে এসেছে। শুভর দ্বিতীয় ফোনটা পেয়ে ক্ষুব্ধ হলেও ফোনটা আগের বারের মত কোন কথা না বলে রেখে দিতে পারেনি প্রদীপ।

ঘন্টাখানেক আগে শ্মশান থেকে ফিরেছে ওরা। সারাবাড়ি শোকে মুহ্যমান। মাকে সামলানোই সবচেয়ে বড় সমস্যা। ছাপ্পান্ন বছরের বিবাহিত জীবন, আগামী মাসেই সাতান্নতম অ্যানিভার্সারিতে দিল্লী যাবার কথা হয়েছিল। সাদা সিঁথি আর সাদা কাপড়ে মাকে দেখে কী ভীষণ বিষণ্ন হয়ে গিয়েছিল প্রদীপের মনটা।

দোতলার ঘরে মাকে নিয়ে গেছে দিদি, চেষ্টা করছে নানা কথায় সরিয়ে রাখতে মার মনটা এই দুঃসহ দুঃখ থেকে। ছোটবোন দোলন আর ওর বর সুদীপ সামনের বারান্দায় বসে আছে নির্বাক। দোলনের মনেও নিশ্চয়ই ওরই মত হঠাৎ আবিষ্কার করা বিরাট একটা গর্ত।

ভাবনার স্তরে স্তরে মনে পড়ছে জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে 'বাবা' মানুষটিকে নতুন নতুন ভাবে আবিষ্কার করার কথা। জীবনের এক এক সময় বাবাকে মনে হয়েছে এক এক রকম। কখনো পালক পোষক রক্ষক, কখনো নির্মম শাষক, কখনো সব ব্যাপারে নাক গলানো বিরক্তিকর অবিবেচক। কিন্তু গত বারো তেরো বছর মানুষটিকে নিখাদ শুভচিন্তক বন্ধু বলেই মনে হয়েছে প্রদীপের, বিশেষ করে শুভ্রার সঙ্গে ঝামেলার সময় থেকে।

কোর্ট কাছারীর হাজার সমস্যা আর অন্তহীন মানসিক যাতনার মধ্যে সারাক্ষণ প্রদীপকে মনের বল দিয়ে গেছেন, পরামর্শ দিয়েছেন বিচার বিবেচনার টানাপোড়েনে। কোর্টে মিথ্যে অপবাদের কারণে অপদস্থ হয়ে ভেঙে পড়া প্রদীপের ঘাড়ে সহায়ের হাত রেখে বলেছিলেন, এই অপবাদের একটি বর্ণও আমি বিশ্বাস করি না দীপু। তোর এই বুড়ো বাবা বেঁচে থাকতে তোকে কেউ কাদায় টেনে নামাবে, এ আমি হতে দেবো না।

তারপর বাবা সত্যিই একদিন বুড়ো হয়ে গেলেন। রিটায়ার করার পর কবে কবে যেন নির্ভরতা দেবার পরিবর্তে নির্ভর

করতে শুরু করে দিয়েছিলেন প্রদীপের ওপর। তবুও কখনো কোন ব্যাপারে মুশকিলে পড়লে, দিশেহারা হলে, মা বলতেন, বাবাকে জিজ্ঞাসা কর। ঠান্ডা মাথায় ভেবে কোন একটা উপায় সে বের করবে ঠিক।

এমনি একটি মানুষের অভাব দৈনন্দিন জীবনে অপূরণীয়। মনের ভিতরে সেটা আরো মর্মান্তিক, সেটা গভীর একটি গর্তের মতই অতল। কবে কী ভাবে যে এই গর্তের কতটা বুজবে কে জানে। পুরো বুজবে না কোনদিনই।

ছোটপিসী বাড়ি গেল মিনিট পনেরো আগে। বড়পিসী এসে পৌছায়নি এখনো মালদা থেকে, তবে খবরটা পেয়েছে। জেঠামশায় গত হয়েছেন চার বছর আগে। জেঠতুতো দাদা চম্পক চলে গেল এই কিছুক্ষণ আগে। জেঠিমা আজ রাতে এখানে থাকবে। মা ছেলে বসেছিল দোলনদের কাছে, ছেলে চলে যেতে জেঠিমা উঠে মনে হয় রান্নাঘরে গিয়েছে হবিষ্যের জোগাড় করতে।

রোদ পড়ে গেছে বলে ঘরের ভিতর আধো অন্ধকার। একা বসে বসে এসব ভাবছিল প্রদীপ, ইচ্ছা করছিল না উঠে আলোটা জ্বালাতে। ফোনটা বাজতে উঠতেই হল। ফোনটা তুলে কানে দিতে দিতে আলোর সুইচটা অন করতে যাচ্ছিল, ওপাশের গলা শুনে আলোর সুইচটা টিপতে ভুলে গেল। ওপাশে শুভর গলা ধরা ধরা, আগেরবারের থেকে আরো বেশি কাতর। প্রায় অস্পষ্ট, কিন্তু আকুল স্বর এল ভেসে, বাবা, ফোনটা রেখে দিও না, প্লিজ।

◈◈◈◈◈

শুভদীপ নামটা রেখেছিলেন বাবা। বলেছিলেন, "তোর আর শুভ্রার দুটো নাম মিলিয়ে এ নামটা ভেবেছি।" প্রদীপেরও বেশ ভাল লেগেছিল নামটা, কিন্তু শুভ্রার আপত্তি। তার পছন্দের নাম ছিল রাহুল। প্রদীপ বলেছিল, আমাদের নামের সঙ্গে মিলিয়ে একটা নাম ভাববে তো! হঠাৎ একটা নাম বলে বসলে যেটার কোন মিল টিল নেই।

মিল থাকতে হবে কেন? শুভ্রার তর্ক, রাহুল বেশ ভাল নাম, মডার্ন। কী সব সেকেলে শুভদীপ টুভদীপ।

তর্ক চলেছিল বেশ, শুভ্রা মানেনি কিছুতেই। প্রদীপ বুঝেছিল ঠিক, আসলে শুভ্রার অমত নামটা বাবার দেয়া বলে। সেটা ভালো হোক খারাপ হোক, শুভ্রা সেটা মেনে নেবে না। বাড়ির লোকেদের সঙ্গে বিদ্রোহটা বজায় রাখতে হবে বলে শুভ্রা এ নামটার অমতে থাকবেই। শুভ্রা কখনো শুভদীপ, কি শুভ নাম ধরে ডাকেনি ছেলেকে। ডেকেছে নিজের দেয়া নামে, রাহুল।

চার বছরের বিবাহিত জীবনের এমনি হাজার ঘটনা ভেসে গেল প্রদীপের মনের ওপর দিয়ে, বেশিরভাগই মতবিরোধের। যেনতেনপ্রকারেন শুভ্রা প্রদীপকে ওর বাবা মার কাছ থেকে দূরে সরাতে চেয়েছিল। সাধারণত ছেলেরা এই সব পরিস্থিতিতে সমঝোতা করে। বাবা মা আর বউ এর বিরোধি মতের মধ্যপথটা খুঁজে নেয়। কিন্তু প্রদীপ তা করতে পারেনি। জেঠতুতো দাদা চম্পক বউকে নিয়ে আলাদা হয়ে যাবার পর বাবা মাকে ডেকে বলেছিল, "মনে মনে তোয়ের হও। ভাগ্যে এই আছে।" সেদিন বাবার মুখটা কী রকম বিষাদে ভরা ছিল সেটা প্রদীপ ভুলতে পারেনি কোনদিন। দিদি আর দোলনের বিয়ে হয়ে গেলে বাবা মার তো ওই একমাত্র ছেলে, একমাত্র সম্বল। না বলা একটা প্রতিজ্ঞা গেঁথে গিয়েছিল ওর মনের ভিতরে, মা বাবার মনে এরকম কষ্টের কারণ সে হবে না কোনদিন।

অন্য সময় প্রদীপ অত ভাবে না, শুভর গলাটা শুনলেই ফোনটা রেখে দেয় কোন কথা না বলে। এই অবস্থা চলছে শুভর ছ'বছর বয়স থেকে, আজ সে দশ বছরের কিশোর। গত চার বছর ধরে ছেলেটা বাবার সঙ্গে কথা বলতে চাইছে, কিন্তু প্রদীপ নিষ্ঠুরের মত লাইন কেটে দেয়।

প্রথমে দু একদিন কিছু যেন বলেছিল, তারপরেই কঠোর হয়ে গিয়েছিল প্রদীপ। ছেলেকে দিয়ে কথা বলানোটা অবশ্যই শুভ্রার কোন চাল। সাধারণ ভাবে এই ভাবনাটা অস্বাভাবিক মনে হলেও এর থেকে বড় বাস্তব আর কিছু হয় না। ডিভোর্সের সময় এবং তার পরে কত রকমে শুভ্রা ওকে নাজেহাল করেছে সে খতিয়ান যারা জানে তারা বোঝে প্রদীপের এই মনোভাব।

একটি উদাহরণ দিলেই বোঝা যাবে। এ বাড়িতে কী নাকি ফেলে গেছে, সেটা নিতে আসতে হবে বলে এসে কোন ফাঁকে প্রদীপের বইয়ের তাকের ওপরে খবরের কাগজের তলায় নোংড়া পর্নোগ্রাফি ম্যাগাজিনগুলো রেখে দিয়ে গেছে। তারপর কোর্টে বলেছে প্রদীপের পারভার্সানে সায় দেয়নি বলে ওকে নাকি প্রদীপ টরচার করত। ওর পারভারটেড চরিত্র প্রমান করার জন্য ঘর ভর্তি এসব ম্যাগাজিনের কথা বলেছিল। প্রদীপ অস্বীকার করলে কোর্ট অর্ডারে ঘর সার্চ করিয়ে ঐ ম্যাগাজিনগুলো বের করে দেখিয়েছিল।

এমনি আরো কত চমক। প্রত্যেকবার শুভ্রার চাল বুঝতে না পেরে ফেঁসে গেছে প্রদীপ। ল-ইয়ার শেষপর্যন্ত প্রদীপকে পরিষ্কার বারণ করেছিল ওকে না জানিয়ে শুভ্রার সঙ্গে কোন কথা না বলতে।

যত রকমভাবে পারা যায় নাস্তানাবুদ করে, সব থেকে বেশি অ্যালিমনির ব্যাবস্থা করে, তবে ডিভোর্স ফাইনাল করেছিল শুভ্রা। মাসে মাসে নিয়মমত টাকা পাঠিয়ে যাচ্ছে প্রদীপ। কিন্তু তাতে নাকি কিছুই হয় না, তাই পরবর্তী পর্যায়ে ছেলেকে করেছে চালের ঘুঁটি।

প্রথমদিকে ভিজিটেশানের নিয়মমত প্রদীপ ছেলেকে নিয়ে আসত সপ্তাহে একদিন। এমনি একটি ভিজিটেশানের পর অভিযোগ করল প্রদীপ আর ওর বাবা মা নাকি ছেলেকে আজেবাজে কিছু খাইয়েছে, ছেলে ভীষণ অসুস্থ হয়ে পরেছিল,

চিকিৎসার খরচের জন্য কয়েক হাজার টাকা ধার করতে হয়েছে যেটা মিটিয়ে দিতে হবে প্রদীপকে।

স্বাভাবিক প্রশ্ন উঠেছিল, কী শরীর খারাপ হয়েছিল শুনি? কে ধার দিয়েছে কত দেখি? আঁতঘাঁত না ভেবে তো শুভ্রা কাজে নামে না। উত্তর তৈরীই ছিল। কে আর সাহায্য করবে ওর মত অসহায় একজন মহিলাকে, ডাক্তার পুরোনো বন্ধু, আর কর্জদাতা বাবা। প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে ধার করে প্রদীপ সে টাকা শোধ করেছিল। তারপর সময়ে খবর পেয়েছিল সে টাকায় ও বাড়িতে কেনা হয়েছে নতুন সাউন্ড সিস্টেম।

তারপর থেকে প্রদীপ আর ছেলেকে কিছু খেতে দিত না। মা আহ্লাদ করে নাতিকে কিছু খাওয়াতে গেলে রাগারাগি করত চূড়ান্ত। শুভ্রার চালের কিন্তু শেষ হয়নি। সে সব সময় ছেলেকে পাঠাতো ছেড়া, ময়লা প্যান্টসার্ট পরিয়ে, যাতে প্রদীপের গিল্টি ফেলিং হয় এই ভেবে যে ওরা ভাল নেই। প্রদীপ দু প্রস্ত জামাপোশাক কিনে দিলে এক সেট চলে গেছে শুভ্রার দিদির ছেলের জন্য।

এমন চাতুরি লেগেই ছিল, কিন্তু ছেলেকে দিয়ে বলিয়ে ধান্ধা করা, এটা প্রদীপের ভাবনার বাইরে ছিল। শুভর তখন ছ' বছর বয়স, সে বাবার কাছে চেয়ে বসল ভিডিও গেইম। প্রদীপের সামন্য খটকা লেগেছিল, ছ' বছরের ছেলে ভিডিও গেইম খেলবে! তারপরেই ভেবেছিল আজকালকার বাচ্চারা কত অ্যাডভান্সড, হতেই পারে। ছেলেটা চাইছে, আর ও না করবে! কী আর করা যাবে, আবার অফিস থেকে ধার হবে।

ছেলেকে নিয়ে প্রদীপ কিনতে গেল ভিডিও গেইম। শুভ পছন্দ করে বসল বাজারের সবচেয়ে দামিটা। বোঝানোর চেষ্টায় প্রদীপ বলল, এটার দাম তো সবচেয়ে বেশি, মাঝারী দামেরটা নে না শুভ।

নাঁ নাঁ, আমি এঁটাই চাঁই, ছেলের বায়না।

অগত্যা দামিটাই কিনতে হল। তারপর জানা গিয়েছিল প্রদীপ যেটা কিনে দিয়েছে সেটা নাকি মোটেই ভাল না। সেটা ফেরত দিয়ে অন্য আরেকটা আনতে হয়েছে। দোকানে খবর করে প্রদীপ জানতে পারল দামিটা পাল্টে শুভ্রা যেটা নিয়ে গেছে সেটার দাম আড়াই হাজার টাকা কম। অর্থাৎ আড়াইটি হাজার টাকা শুভ্রার ট্যাঁকে।

খবরটা শুনে ভীষণ রেগে গিয়েছিল প্রদীপ, শুভ্রার থেকে বেশি ছেলের ওপর। যেমনি মা তেমনি হয়েছে ছেলে। প্রদীপ যখন বলেছিল তখন তার সবচেয়ে দামিটাই চাই। তারপর মার কথায় সেটা ছেড়ে সস্তারটা নিতে তার কোন আপত্তি নেই। সব প্ল্যান করা, সব মা ছেলের প্ল্যান। নাহ্, আর কোন যোগাযোগের দরকার নেই এমন ছেলের সঙ্গে। বন্ধ করে দিয়েছিল প্রদীপ শুভকে নিয়ে আসা। তারপর থেকে চলেছিল ছেলের টেলিফোনের পর টেলিফোন।

◈◈◈◈◈

ওপাশে ফোনটা রেখে দেবার আওয়াজ পায়নি বলে শুভ যেমন খুশি তেমন হতভম্ব। কী বলবে যেন ভেবে পাচ্ছিল না। কেবল বলছিল, থ্যাংক ইউ বাবা, থ্যাংক ইউ।

কী বলবে বলো, প্রদীপ গম্ভীর গলায় বলেছিল, ফোন করেছো কেন?

বাবা, শুভর কান্নভেজা গলা, ঠাকুরদা মারা গেছেন বলে আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে।

প্রদীপ চুপ করে থেকে ভাবছিল ছেলে শেয়ানা হয়েছে বেশ। মার শেখানো বুলি আওড়াবার সময় গলায় আবেগ আনছে ভাল। ঠান্ডা গলায় বলেছিল, বেশি কষ্ট কোরো না। টিভি খুলে কোন কার্টুন দেখো, কিংবা খেলার ভিডিওবক্স খুলে কোন গেমস খেলো।

এমন মনখারাপ নিয়ে আমি এসব কিছু করতে পারবো না বাবা।

ও, এদিকে আমার তো এখন সময় নেই তোমার সঙ্গে অনেক কথা বলার। তুমি....

বাবা, শ্মশানে যাবার আগে যদি কথা বলতে তাহলে ঠাদ্দুকে শেষ বারের মত একবার দেখতে পেতাম।

ঠাকুরদার জন্য কত দরদ! মার উস্কানিতে ঠাকুরদাকে কম জ্বালায়নি নাতি। পেনসানের স্বল্প আয় থেকে নাতির জন্য কত যে খরচ বাবা করেছেন সেটা প্রদীপ জানে। প্রতিদানে বাবাকে শুনতে হয়েছে অভিযোগ, তিনি নাকি আজেবাজে লোভনীয় জিনিসপত্র কিনে দিয়ে ছোট্টছেলেটার ব্রেন-ওয়াশ করছেন যাতে মাকে ছেড়ে চলে আসে। ঠান্ডা গলায় প্রদীপ বলেছিল, বেঁচে থাকতে ঠাদ্দুকে দেখোনি, মরবার পর আর কী দেখবে।

ঠাদ্দুকে তো আর কোনদিন দেখতে পাবো না বাবা, আমার ভীষণ মনখারাপ লাগছে।

হবে...., প্রদীপের গলায় অবিশ্বাস।

বাবা, ওপাশ থেকে অস্থির গলায় শুভদীপ বলেছিল, তুমি আমাকে বিশ্বাস করো বাবা।

স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল প্রদীপের মনের গতি। ঠান্ডা হীমশীতল গলায় বলেছিল, তোমার মার শিক্ষায় যতদিন আছো ততদিন বিশ্বাস তোমাকে আমি আর করতে পারবো না শুভ।

ফোনটা রেখে দিয়েছিল প্রদীপ। পনেরো বছর আগে সেই ছেলের সঙ্গে শেষ কথা প্রদীপের।

◈◈◈◈◈

শুভ্রার পারলৌকিক কাজকর্ম সময়মত সব হয়ে গেল। স্ত্রীর এসব কাজে স্বামীর উপস্থিত থাকার কোন প্রয়োজন পড়ে কিনা প্রদীপ তা জানে না। প্রদীপ এ ও জানে না ডিভোর্স হয়ে গেলে কোন অশৌচ থাকে কিনা। কাকেই বা জিজ্ঞাসা করবে, মা বাবা কেউ তো আর বেঁচে নেই। মনে হয় না কিছু করার আছে, তবুও মনের ভিতরে খচখচটা থেকে গেল।

নিজের মনে ভেবে ভেবে প্রদীপ কোন সমাধানে আসতে পারল না। অস্বস্তি বিশেষ করে এই কারণে যে বিয়ে হয়েছিল হোম অগ্নির সামনে, ঘটের ওপর বদ্ধহাত অবস্থায়, বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করে। আর ডিভোর্স হয়েছে একটা কাগজে সই করে। সাধারণ একটা সই কী মন্ত্রের সঙ্গে মেনে নেয়া সব সম্পর্ক দায় দায়িত্ব নিস্প্রয়োজন করে দিতে পারে?

তাছাড়া যে ব্যাপারটা গত বিশ বছরের ওপর একই রকম থেকে গেছে তা হল শুভ্রা আর ও ডিভোর্স নিয়ে আলাদা থাকলেও, কেউ আবার বিয়ে করেনি। শুভ্রা কেন করেনি তা প্রদীপ জানে না, তাই বলে শুভ্রার প্রতি কোমল অনুভবের কারণে ও আবার বিয়ে করেনি এমন না। বস্তুত শুভ্রার সঙ্গে চার বছরের জীবনের অভিজ্ঞতা আবার কোন মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক থেকে ওকে দূরে ঠেলে রেখেছে। তবুও আরেকটা বিয়ে করা হয়নি বলে কেমন যেন আগের বিয়েটা পুরো শেষ হয়েও হল না।

এসব প্রদীপের একান্ত আপন ভাবনা। শুভ্রার জন্য শেষ কিছু করা হল না বলে যে অস্বস্তিটা মনের ভিতরে বসে আছে তার থেকেও অনেক বড় ভাবনা ছেলেটা যে এক্কেবারে একা হয়ে গেল। এটা ঠিক যে আজ শুভ পঁচিশ বছরের যুবক। আজ সে চাকরি করা স্বাবলম্বী একটি ছেলে। তার পক্ষে একা থাকা অসম্ভব কিছু না। কিন্তু থাকবে কেন? বাবা বেঁচে থাকতে ছেলে একা থাকবে কেন!

শুভ্রার কাজকর্মের দুদিন পর প্রদীপ আর ফোন করল না, সোজা চলে এল শুভদীপের সঙ্গে কথা বলতে। দরজা খুলে বাবাকে দেখে শুভদীপ কিছুটা অবাক, কিছুটা বিহ্বল, কিছুটা বিরক্ত। ছেলের মুখে কোন কথা নেই দেখে প্রদীপ বলল, ভিতরে আসতে বলবি না?

ভীষণ খারাপ লাগছিল কথাগুলো বলতে, তবুও অভিমানে বুক বেঁধে, বাবার মুখের দিকে না তাকিয়ে, একদমে শুভ বলল, না, তোমাকে ভিতরে আসতে বলতে পারছি না আমি।

ছেলের প্রত্যাখ্যানের চাপড়টা অসহনীয়। বুকের ভিতরে চাপ চাপ ব্যথা, যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে প্রদীপের। কিছুক্ষণ নির্বাক থেকে দম ধরল প্রদীপ। তারপর ধীর গলায় বলল, আমার বাবার অপমান সহ্য করতে পারিনি বলে আমার ছেলেকে কষ্ট দিয়েছি। তুমি যেদিন বাবা হবে সেদিন বুঝতে পারবে আজ তুমি যা করলে সেটার আঘাত কতো বড়ো।

নতমুখ মানুষটা পায়ে পায়ে ফিরে গিয়েছিল। সে দিকে তাকিয়ে শুভর মনখারাপ হয়ে গিয়েছিল খুব, কিন্তু সে মনখারাপ ছাপিয়ে গিয়েছিল বুকভরা অভিমান। গত পনেরো বছর সে অপেক্ষা করেছিল এই মানুষটি ডাকবে বলে, কিন্তু সে ডাকেনি। আজ এ ডাকের কোন প্রয়োজন ওর নেই। আজ সে একা একা থাকতে পারবে। কাউকে ওর দরকার নেই।

মানুষ ভাবে এক, হয় আর। তিনদিন পর লোকাল হাসপাতাল থেকে আসা ফোনটা পেয়ে চমকে গেল শুভ।

হ্যালো, আপনি কী মিস্টার শুভদীপ রায়চৌধুরী?

হ্যাঁ, কেন বলুন তো?

মিস্টার প্রদীপ রায়চৌধুরী মারাত্মক হার্ট অ্যাটাকে আক্রান্ত হয়ে রাস্তায় পড়ে গিয়েছিলেন। পথের লোকেরা ওকে এখানে নিয়ে এসেছে। আই সি ইউতে অজ্ঞান অবস্থায় তিনি মরনের সঙ্গে লড়ছেন। ওর মানিব্যাগে আপনার নাম টেলিফোন নাম্বার পাওয়া গেছে। আপনাদের পদবী দেখছি এক। উনি কী আপনার আপন কেউ হন? আপনি এক্ষুনি একবার এ হাসপাতালে আসুন।

স্তব্ধ হয়ে গেল শুভদীপ। সেদিন বাড়ির দরজা থেকে সে যখন নির্মম ভাবে তাঁকে ফিরিয়ে দিয়েছিল তখনই কী ঈশ্বরের এই বিচার করা হয়ে গিয়েছিল! বিধাতা কী তখনই স্থির করেছিল যে এমন নির্মম শাস্তি দিয়ে ওকে শেখাবে আপন পর কী! প্রদীপ রায়চৌধুরীর ওর আপন কেউ তো বটেই, জন্মদাতা পিতা। শরীরে বইতে থাকা রক্তের ধারাকে অস্বীকার করা কী কখনো সম্ভব!

শান্ত কিন্তু উদ্বেগ ভরা গলায় শুভ বলল, আমি এক্ষুনি আসছি।

লরেল, ম্যারীল্যান্ড
জুলাই ২২, ২০১১ ইং